হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যা, এপ্রিল ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

ধর্ম যদি তেজী, বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান, সাহসী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী মানুষই তৈরী করতে না পারে, সে ধর্মকে আমি ধর্ম বলে মানতে রাজী নই। ধর্ম কি মানুষকে ভীরু করে? ধার্মিক মানুষই তো হবে সাহসী মানুষ, তেজস্বী মানুষ। তিনি এই পৃথিবীর নশ্বরতা জানেন, জানেন আত্মার অমরত্ব। তাঁর তো ভগবানকেও ভয় নিষ্প্রয়োজন।

— শিবপ্রসাদ রায়

হরিণঘাটায় পাগল ঠাকুরের মেলা ও মন্দির আক্রান্ত

হরিণঘাটার পাগলাতলায় আক্রান্ত মন্দিরের ভিতরে নাড়ুগোপালের ভাঙা মূর্তি

মুসলিম দুষ্কৃতিদের আক্রমণে চোখ হারাতে বসেছেন সুনীল সিংহদার

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত মোল্লাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাতলা গ্রামে পাগল ঠাকুরের মেলা বহু প্রাচীন। প্রতি বছর ১৩ই চৈত্র পাগল ঠাকুরের মন্দির নামে খ্যাত শিবমন্দিরে আশপাশের হাজার হাজার হিন্দু নারী জল ঢালতে আসে। সেই উপলক্ষে বসে একদিনের এই মেলা। পাশেই মিত্রপুর মুসলিম প্রধান একটি বড় গ্রাম।

এই গ্রাম পাইপগান ও অবৈধ অস্ত্র তৈরি ও ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় লোকেদের মতে এই গ্রামের সাদেক ও মাসুদ এই কাজে অতি দক্ষ এবং তারা যথারীতি রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদধন্য। তাই হরিণঘাটা থানার পুলিশ এদের কীর্তিকলাপ দেখতে পায় না। অবশ্য সাদেক-মাসুদের কাজের বখরার লভ্যাংশ থেকে তারা বঞ্চিত নয়। তাই এই দুই ডন সাদেক-মাসুদের দাপটে এলাকার হিন্দুরা ভয়ে কাঁপে।

পাগল ঠাকুরের মেলার আগেই গুণ্ডারা তাদের বিচিত্রানুষ্ঠান করবে বলে ১০০০০্ টাকা দাবি করে। মেলা কমিটি এই টাকা দিতে রাজি হয়নি। তখন এলাকার কোন এক স্বনামধন্য তৃণমূল কংগ্রেসী নেতার মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে মেলা কমিটি ঐ গুণ্ডাদেরকে অনুষ্ঠানের জন্য বস্ত্রদান করবে। ১৩ই চৈত্র বা ২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় যখন মেলা পুরোদমে চলছে, মেয়েরা মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালছে, তখন হঠাৎ তিন-চারশত মুসলমান সশস্ত্র হয়ে মেলা আক্রমণ করে। মেলায় দর্শনার্থী ও মন্দিরে পুণ্যার্থীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা আক্রমণের শিকার হয়। এলোপাথাড়ি চলতে থাকে তাদের উপর মার। সঙ্গে জল ঢালতে আসা মেয়েদের গায়ে হাত ও অশ্লীল গালাগালি। মুসলিম হামলাকারীরা একের পর এক দোকান ভাঙতে থাকে ও লুট করতে থাকে। ব্যারিকেডের বাঁশ খুলে নিয়ে সেই বাঁশ দিয়ে হিন্দুদের পেটাতে থাকে। তারপর তারা যায় মন্দিরে। মন্দির ও পাশের গাছতলায় টিনের শেডের নীচে ছিল অনেক দেবদেতার মূর্তি। হামলাকারীরা এই সমস্ত মূর্তিগুলি ভেঙে চুরমার করে দেয়। এরমধ্যে ছিল লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, কালী, কৃষ্ণ ও গণেশের মূর্তি। মন্দিরের ভিতরে শিবঠাকুরের সামনে প্রণামীর থালা থেকে সমস্ত টাকাপয়সা তুলে নেয়। নাড়ুগোলাপের মূর্তির হাত ও পা ভেঙে দেয়। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে লুট হয় টাকাপয়সা, ঘড়ি, আংটি, চেন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে ২৬টি সাইকেল এবং ডেকরেটরের ২০টি প্লাস্টিকের চেয়ার ও চল্লিশটি বাঁশও নিয়ে চলে যায় তারা। মেলাকমিটির অফিসেও হামলা হয়। সুনীল সিংহদার ও অজিত গোলদার অফিসে বসে থাকা অবস্থাতেই প্রচণ্ড প্রহৃত হন। সুনীল সিংহদারের ডান চোখ এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যে তার ঐ চোখ আর সারবে কিনা বলা কঠিন। এছাড়া আহতদের মধ্যে আছেন জগদীশ গোলদার, শংকর সরকার, জয়দেব রায়, সুজয় মন্ডল, উদ্ধব গোলদার, তপন রায়, মানিক গোলদার, পাঁচুগোপাল মন্ডল ও আরও অনেকে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল সাদেক, মাসুদ, সাব্বির গোলদার, কবীর গোলদার, দুলাল মন্ডল, হায়দর আলি গোলদার, বিশে গোলদার, রতন গোলদার, রব্বারি মন্ডল, আলতাফ গোলদার, মাফরোজ গোলদার, ময়নাক মন্ডল, আলামৎ বাগ, লাল্টু গোলদার, মজনু গোলদার, মৈনুর, ইজ্জল, মবিজুল, ফিরোজ, রফিক, রাজু এবং আরও অনেকে।

হামলা শুরু হয় সন্ধ্যা সাতটায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে বার বার ফোন করা হয়। হরিণঘাটা থানা থেকে উত্তর আসতে থাকে (১) থানায় বেশি পুলিশ নেই, (২) গাড়ি নেই, (৩) গাড়িতে তেল নেই। সুতরাং পুলিশ আসে না। তারা আসে ঘটনা ঘটার পাঁচ ঘণ্টা পর প্রায় রাত্রি ১২টায়। এসে ঘটনার ভয়াবহতা দেখে ও হিন্দুদের কাছে অভিযোগ শুনে

শেষাংশ চতুর্থ পাতায়

ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন আয়োজিত বাংলাদেশ বিষয়ে সেমিনার

খালেদা জিয়াকে নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করেন বাজপেয়ী

গত ২৮/৩/১০ তারিখে মহাজাতি সদন অ্যানেক্স ভবনে ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশন আয়োজিত ''ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক'' বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদিক শ্রী মানস ঘোষ। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে বাংলাদেশে ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে হারিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে জেতাতে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সাহায্য করেন। এটা ছিল বাজপেয়ীর চরম ভুল সিদ্ধান্ত। এই ভুলের খেসারত দিতে বাংলাদেশে হাজার হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছিল, বিশেষ করে বরিশালের ভোলা জেলার হিন্দু নারীদের অবস্থা হয়েছে অবর্ণনীয়। বাজপেয়ীর এই সাহায্যের প্রতিদান দিতে ক্ষমতায় বসেই মৌলবাদী B.N.P ক্যাডাররা সারা বাংলাদেশব্যাপী যে তান্ডব চালিয়েছে তার পরিণামে ১৫–২০ লক্ষ হিন্দুকে ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই সমস্ত কথাগুলি বলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক শ্রী মানস ঘোষ। শ্রী ঘোষ আরও বলেন যে, বেগম খালেদা জিয়া বাজপেয়ীকে বুঝিয়েছিলেন, যেহেতু শেখ হাসিনার ভারতপন্থী ইমেজ আছে তাই হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের মাটির নীচের গ্যাস দিতে পারবেন না, কিন্তু আমি ক্ষমতায় এসেই ছয় মাসের মধ্যে ভারতকে গ্যাস সাপ্লাই করব। এই কথাগুলি বাজপেয়ীর কানে খুব মধুর লেগেছিল এবং তিনি এই কথা বিশ্বাস করে নির্বাচনে বেগমকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পর বেগম যথারীতি সে প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছেন এবং তার ক্যাডার বাহিনীকে দিয়ে হিন্দু গণহত্যা, হিন্দু নারী গণধর্ষণ, হিন্দু বিতাড়নের কাজগুলি করেন। এই ভয়ংকর অত্যাচারে

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

১৪ই এপ্রিল
ভারতরত্ন ডঃ বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর এর ১২১–তম জন্মদিনে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমাদের কথা

শরীয়তী বিচারে আরবে ১৭ ভারতীয়ের প্রাণদণ্ডের হুকুম

সত্যি কথাটা বলার সময় এসেছে। সত্যি কথা শোনার বোঝার মানার লোক কম। একদিকে সত্য আর একদিকে টাকা থাকলে বেশীরভাগ মানুষই টাকার দিকে ছুটবে। সত্যের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু আজ যখন ১৭ জন ভারতীয় সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে বিনা অপরাধে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছে, তখন এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর সময় এসেছে যে তোমরা শুধু টাকার লোভে আরব দেশে গিয়েছিলে। তখন কি তোমরা জানতে না যে ওটা ইসালামিক দেশ? ওখানে কোন আধুনিক বিচার চলে না! চলে শরীয়তেরর বিচার। ওখানে তোমরা ন্যায়বিচার পাবে না, পাবে ইসলামিক বিচার। যে বিচারে চোখের বদলে চোখ উপড়ে নেওয়া হয়, চুরির শাস্তি দেওয়া হয় হাত কেটে। এসব কি না জেনেই গিয়েছিলে? ওদেশে ওদের কাছে পেট্রলের অনেক টাকা আছে। সেই টাকা দিয়ে ওরা তোমাদের পরিশ্রম, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে (skill) কিনে নেবে তাদের আরাম-আয়েষের জন্য। কিন্তু তোমরা ওদের চোখে ঘৃণিত কাফেরই থাকবে। তোমার ধর্মাচরণের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকবে না ওখানে। মঠ, মন্দির, গুরুদ্বারা নির্মাণ করা তো স্বপ্ন, প্রকাশ্যে তোমার ভগবানের নামটুকুও তুমি নিতে পারবে না। খাদ্যের ব্যাপারে তোমরা কোন স্বাধীনতা থাকবে না। এমনকি রোজার সময় দিনের বেলায় তোমাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খাবার খেতে হবে। এসব জেনেও তো শুধু টাকার লোভেই তোমরা মধ্য প্রাচ্যের ওইসব ইসলামিক দেশগুলোতে গিয়েছ।

ভারতের তিনটি রাজ্যের লোক বেশী পরিমাণে মধ্য প্রাচ্যের ওই দেশগুলিতে যায়। পাঞ্জাব, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ। এছাড়া যায় নেপালীরা। আর পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীও প্রচুর পরিমাণে যায়। ওখানে যেসব ভয়ানক অমানবিক ঘটনা ঘটে এদের জীবনে, অনেকেই তো এসে প্রকাশ করে না। তবু মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়ে যায়। এই তো কয়েকদিন আগে দুবাইতে এক বৃটিশ দম্পতি রেষ্টুরেন্টে বসে চুম্বনের অপরাধে তাদের জেল হয়ে যায়।

বর্তমান ঘটনাটিতে সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে একজন পাকিস্তানী নাগরিক খুন হয়ে যায়। অভিযুক্ত হয় ১৭ জন ভারতীয়। এদের মধ্যে ১৬ জনই পাঞ্জাবের। এদের দাবী এরা দোষী নয়। কিন্তু শরীয়তী কোর্টে এই কাফেরদের পক্ষে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করা খুবই কঠিন। এরা প্রমাণ করতে পারে না। তাই ১৭ জনেরই প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। এখন ভারতে এদের আত্মীয়স্বজনরা কেঁদে কুল পাচ্ছেন না। শুরু হয়ে গেছে তদ্বির, তদারকি, দরবার, আবেদন নিবেদন। ভারত সরকারের বিদেশ বিভাগও তৎপর হয়েছেন। কিন্তু যারা অর্থের লোভে আরব দেশগুলিতে যাওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁরা সেই হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্যের গল্পের উপদেশটা মনে রাখলে ভাল করবেন। সেই রাজ্যে মুড়ি মিছরির একদর দেখে যে বোকাটা প্রলুব্ধ হয়েছিল, তার গুরুদেব নিষেধ করা সত্ত্বেও ওই রাজ্যেই থেকে গিয়েছিল, শেষে তার কি দুর্গতি হয়েছিল। তাই বিশ্বের যে সব দেশে সভ্য দুনিয়ার বিচার নেই, অর্থের লোভে সেইসব দেশে যাওয়ার আগে, বন্ধু বার বার ভাববেন। বিপদ ঘটলে একে তাকে দোষারোপ করে পার পাবেন না।

মিশনারী খপ্পর থেকে উদ্ধার উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭৬টি আদিবাসী শিশু

এক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তামিলনাড়ু পুলিশ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের খৃষ্টান মিশনারীদের এক ডেরা 'বেথেসডা ব্লেসিং মিনিষ্ট্রিজ হোম', প্লাবিলাই, কালিয়াক্কাবিলাই থেকে উদ্ধার করেছে ৭৬টি শিশু। বাসের অযোগ্য এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে রাখা আসাম ও মণিপুরের জেমি উপজাতির এই শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই আবার বালিকা। হোমের পরিচালক এক পাদ্রী, নাম শাজী। শাজীকে গ্রেপ্তার করলেও পালিয়েছেন রেভারেণ্ড পল যিনি নিজেও এক জেমি উপজাতির খৃষ্টান পাদ্রী। ইনিই দরিদ্র পিতা-মাতার থেকে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা এবং ভাল খাদ্য-বস্ত্রের লোভ দেখিয়ে মাথাপিছু ৫,০০০ টাকা আদায় করে সুদূর দক্ষিণ ভারতের উক্ত হোমে তুলে ছিলেন। মিশনারীদের কালো হাত অনেক বিস্তৃত হলেও ব্যাপারটা গড়ায় সুপ্রীম কোর্ট অবধি। প্রধান বিচারপতি সহ তিন বিচারকের নিকট আদালত বান্ধব অপর্ণা ভটের আবেদন শুনে প্রকৃত দুষ্কৃতিদের ধরতে ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রটেকশান অফ চিল্ড্রেন'স রাইটস্‌কে আদালত তদন্তের নির্দেশ দেন। শিশু পাচারে খৃষ্টান মিশনারীদের ক্রমবর্ধমান অপকর্মে সুপ্রীম কোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্যাষ্টর শাজীকে কোয়েম্বাটুর জেলার সোমানুর থেকে গত ১২ ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করে বিচার বিভাগের হেপাজতে রাখা হয়। বর্তমানে ৭৬টি শিশুকেই তাদের বাবা-মায়েদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

(সূত্র ঃ টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া, ১.৪.২০১০)

পরলোকগত পোপ জন পল দ্বিতীয়ের 'সেন্ট' সন্ত হওয়ার ঘোষণা বিশ বাঁও জলে

খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ। বিগত পোপ পরলোকগত জন পল(দ্বিতীয়)কে 'সেন্ট' উপাধি দেওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা অভিযোগে এই চেষ্টা সফল হতে পারছে না। পরলোকগত পোপ জন পলের বন্ধু অষ্ট্রিয়ার কার্ডিনাল (পদটি অতি উচ্চস্তরের পাদ্রী) হানস হেরম্যান গ্রোয়ের কয়েক দশক ধরে ২০০০ বালকের উপর যৌন অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও উক্ত পোপ তাঁর ২৬ বছরের সর্বোচ্চ পদে থাকা সত্ত্বেও হেরম্যানের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করেন নি। ফলে পোপের 'সন্ত' মরণোত্তর পদবী পাওয়া এখন বিশ বাঁও জলে বলে 'সানডে টাইমস্' পত্রিকায় প্রকাশিত।

ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রীদের এই নৈতিক অধঃপতনের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই পাদ্রী ও যাজকদের বিরুদ্ধে শত শত ক্রিমিনাল মামলা ঝুলছে। কোর্টের বাইরে এগুলি ফয়সালা করতে গিয়ে চার্চগুলিকে কোটি কোটি ডলার বা পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। এরজন্য অনেক চার্চ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কিছু চার্চ বিক্রি হয়ে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মন্দিরও তৈরী হচ্ছে।

বোরখা ত্যাগের শর্তে ফ্রান্সে বসবাসের অধিকার

প্যারিস, ৮ ফেব্রুয়ারী' ১০। ফ্রান্সে বসবাসে ইচ্ছুক বিদেশী নাগরিকদের জন্য নতুন নিয়ম জারি হয়েছে—বোরখা পরা চলবে না। নতুন আইনে বিদেশী নাগরিকদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা বোরখা পরবে না।

পরিবার মন্ত্রী নেডিনা মোরানো বলেছেন, সমানীরকণ অঙ্গীকারের মধ্যে বোরখা ত্যাগ তো করতেই হবে, তার সাথে মহিলাদের 'খতনা' করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নিয়মানুসারে অঙ্গীকার পত্র দিলে তবেই কোন বিদেশী নাগরিককে ফ্রান্সে বসবাসের অধিকার দেওয়া হবে। ২০০৭ সাল থেকে বসবাসকারী সকল নাগরিককেই উক্ত শর্ত পালন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ফ্রান্স সরকার বোরখার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে কড়া আইন চালু করতে চলেছেন। সংসদীয় সমিতির এক রির্পোটে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সার্বজনিক পরিবহন সেবায় বোরখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার সুপারিশ করা হয়। মন্ত্রীর কথায়, বলপূর্বক বিবাহ এবং বহু বিবাহকারীদের ফ্রান্সে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ ফরাসী সমাজে পুরুষ এবং মহিলাদের সমানতা হল তাদের মৌলিক অধিকার।

বাগনানে সংহতি কর্মীদের সাহসী প্রতিরোধ

হাওড়া জেলার বাগনানে চন্দ্রপুর গ্রামে দামোদর নদীর পাশে A . G . K . Polyfill. Pvt . Ltd. নামে একটি কারখানার নির্মাণ কাজ চলছে। লেবার কনট্রাকটর নির্মল চক্রবর্তী দঃ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থেকে ২৪ জন মুসলিম ও ৪ জন হিন্দু শ্রমিককে ওখানে কাজের জন্যে নিয়ে আসে। মুসলিম ও হিন্দু শ্রমিকদের এক সঙ্গে রান্নাবান্না হয়। ফলে মুসলিমদের জন্য গোমাংস ও হিন্দুদের জন্য ডিম একই সাথে রান্না করা হয়। কিন্তু হিন্দু শ্রমিকেরা গোমাংসের সাথে রান্না করা ডিম খেতে অস্বীকার করে। ফলে সংখ্যাধিক্য মুসলিম শ্রমিকেরা হিন্দু শ্রমিকদের মারধর করে ও একটি ঘরে তালাবন্দী করে রাখে। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা সেখানে ছুটে যায় ও তালাবন্ধ হিন্দু শ্রমিকদের উদ্ধার করে। তারপর হিন্দু সংহতি কর্মীদের দাবীমত কোম্পানী নির্মল চক্রবর্তীর মাধ্যমে আর কোন শ্রমিক আনবে না এই প্রতিশ্রুতি দেয় এবং হিন্দু শ্রমিকদের তালাবন্ধ করার অপরাধ স্বীকার করে ও তিন হাজার টাকা জরিমানা দেয়। স্থানীয় হিন্দুরা ওই সকল মুসলিম শ্রমিকদেরকে উত্তম মধ্যম দেয়।

১০ শতাংশ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের প্রতিবাদে বনগাঁ শহরে ২৯ মার্চ সোমবার হিন্দু সংহতির উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল। টাউনহল মাঠ থেকে বের হয়ে পুরো শহর পরিক্রমা করে এই মিছিল। শেষে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন অজিত অধিকারী, অরবিন্দ বিশ্বাস, নিশীথ ঘোষ ও অমল প্রামাণিক।

প্রথম পাতার শেষাংশ

বাংলাদেশ বিষয়ে সেমিনার

বাংলাদেশের হিন্দুরা যখন ত্রাহি ত্রাহি করছে, তখন সেখানকার আমার বন্ধু অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দু আমার কাছে আকুল আবেদন জানান যে তাদের সঙ্গে বাজপেয়ীজি অথবা আদবানীজি (তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে। আমি রাজ্য বিজেপির নেতা অধ্যাপক তথাগত রায়কে এই অনুরোধ জানাই। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। বাজপেয়ী ও আদবানী সাহেবরা এতই ব্যস্ত থাকেন যে বাংলাদেশের হিন্দু নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় দিতে পারেন না। শ্রী মানস ঘোষ তাঁর প্রাণবন্ত বক্তব্যে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের আরও বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং পরলোকগত ডাঃ সুজিত ধরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সেমিনারে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অসীম কুমার মিত্র, তরুণ বিজয়, অধ্যাপক মোহিত রায় এবং অরিন্দম মুখার্জ্জী ও অরুণ ভট্টাচার্য্য।

বর্তমান পোপও বিতর্কিত, ব্রিটেনে তাঁর আগামী সফর নিয়ে তোলপাড়

বর্তমান পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ আগামী সেপ্টেম্বরে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে চার দিনের সফর করবেন। ইতিমধ্যেই ১০,০০০ ব্যক্তি তাঁর রাজকীয় সফরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন। ব্রিটেনের করদাতাদের প্রায় দেড় কোটি পাউণ্ড এই বাবদে ব্যয় হবে। ভ্যাটিকানের প্রধান হিসাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ নিয়ে তিনি সমকামী পাদ্রীদের যৌন নিগ্রহের সমর্থক বলে পার পেতে পারেন না। সারা ইউরোপ জুড়ে পাদ্রীদের অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ যত প্রকাশিত হচ্ছে ততই ব্রিটেনে প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে।

পোপের শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রচেষ্টা আরো একবার সামনে এল ভ্যাটিকানে ইষ্টার উৎসবের (Mass) পর্বে। পবিত্র রবিবারের অনুষ্ঠানে কার্ডিনাল কলেজের ডীন কার্ডিন্যাল এঞ্জেলো সেডানো প্রথা ভেঙে পোপের পূর্বে ভাষণ দিয়ে জানালেন, পাদ্রীদের নিয়ে অভিযোগগুলির গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটা 'Petty Gossip'—মিথ্যা রটনা মাত্র। তিনি বলেন, বিশ্ব জুড়ে ৪ লাখ 'প্রিষ্ট' স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও মিশন চালান। সামান্য কতিপয় 'প্রিষ্টদের শিশু নিগ্রহের কথা তুলে ভ্যাটিকানের প্রতিষ্ঠাকে ছোট করে দেখানোর অপচেষ্টা চলছে।

এর প্রতিবাদে আমেরিকার SNAP (Survivors Network of those Abused by Prists) নেত্রী বারবারা ব্লেইন জানান, অত্যাচারিতেরা সান্ত্বনা ও নিরাময় হতে চান, বিদ্রূপ নয়। পোপই বলেছেন, সত্য প্রকটিত হোক। তাহলে গোপনীয়তা ও ধামাচাপা দেবার চেষ্টা কেন? চার্চগুলি বিভিন্ন দেশে এসব সত্য গোপন করতে সক্রিয়। এমনকি পোপ স্বয়ং স্বদেশ জার্মানী এবং রোমে অনুরূপ 'সেক্স স্ক্যান্ডাল' নিয়ে নীরব ছিলেন।

প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা গুলিয়ে গিয়েছে

তপন কুমার ঘোষ

খুব দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে এ মাসের লেখাটা শুরু করছি। কারণ এবার লেখার বিষয়বস্তু 'ধর্ম কি?' হাতি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল। ধর্ম বিষয়ে ব্যাস-বশিষ্ঠদেব থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীচৈতন্য, থেকে শুরু করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রামতীর্থ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ—এত বড় বড় মহাপুরুষ ও ধর্মবেত্তারা আলোচনা করেছেন। তারপর আমার মত এক অতি নগণ্য ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করার স্পর্ধা রাখে কি করে? তাই এই সংকোচ। আমি জানি, জ্ঞানীগুণী, বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই নগণ্য ব্যক্তি, এই অবাচীনের 'ধর্ম' বিষয়ে লেখা একটা লাইনও পড়বেন না। তাতে ক্ষতি নেই। কারণ, তাঁদেরকে ধর্ম বোঝানোর জন্য এই লেখা নয়। আজকের বাংলার যুবসমাজকে 'সঠিক ধর্ম কি' এবং 'ধর্মটা আসলে কি'—একথা বোঝানোর জন্যই এই লেখা। শুধু যুবকদের জন্য আমার এই লেখা উৎসর্গ করলাম।

ভাইসব, 'ধর্ম' শব্দটা শুনলেই সকলের মনে পূজা, পাঠ, মঠ, মন্দির, ঠাকুর, দেবতা, মূর্তি, মালা, তিলক, ভজন, কীর্তন, জপ, যজ্ঞ—এই বিষয়গুলো স্মরণে আসে। তাই একজন ব্যক্তিকে চন্দনের তিলক কেটে গায়ে নামাবলী দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন দেখলে মনে হয় যে উনি নিশ্চয় কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজে যাচ্ছেন। একজন মহিলা স্নান করে লাল পাড় শাড়ি পরে হাতে নৈবেদ্যের পিতলের থালা নিয়ে যাচ্ছেন। দেখলেই আমাদের মনে হয় যে মহিলাটি নিশ্চয় ধর্মের কোন কাজে যাচ্ছেন। তেমনি ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরপুজো হচ্ছে দেখলে তো মনে হয়ই যে ধর্মানুষ্ঠান হচ্ছে। ঠিক তেমনি আজকে ধর্মের একটা বড় রূপ হয়েছে—সংকীর্তন, নাম ও জপ। আমাদের বাংলা ও আসামে যজ্ঞ অনুষ্ঠানটা কম। বাকি ভারতে সেটাও প্রচুর। এগুলোকেই সমাজে সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে মনে করে। আর তাতেই হয় যত বিপত্তি। আমার মত—ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রচলিত ধারণাটিই আমাদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের অধঃপতনের মূল ও প্রধান কারণ। মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়, কম্যুনিস্ট নয়।

আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা এসব বিষয়ে কোন বক্তব্য বা প্রশ্ন নিয়ে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বয়োঃজ্যেষ্ঠ গুরুজন বা গুরুদেবদের কাছে যাও। তাঁরা রে রে করে উঠবেন। তাঁদের কাছ থেকে বহু শাপশাপান্ত গালাগালি তোমাদেরকে শুনতে হবে। কারণ, প্রশ্নতে এঁদের বড় অরুচি। এঁরা শুধু শ্রদ্ধা চান আর ভক্তি চান। এঁরা নচিকেতার কাহিনী জানেন। মানেন না। নচিকেতা একজন বালক হয়েও মৃত্যুর ওপারে কি আছে— যমের কাছে জানতে চেয়েছিল। শুধু চায়নি, জেদ করেছিল। এবং উত্তর জেনেছিল। 'তোমার ওকথা জানতে নেই'---যমরাজার একথা সে মানেনি। তাই নচিকেতাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'কঠোপনিষদ'। অর্জুন কৃষ্ণের আদেশ এককথায় মেনে নিলে গীতা তৈরিই হত না। অর্জুনের শতখানেক প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হননি। এমনকি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের থিওরিটিক্যাল উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে কৃষ্ণ তাকে প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনও দিয়েছিলেন বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা। সুতরাং, আমাদের হিন্দু ধর্মে, সনাতন ধর্মে, 'প্রশ্ন' অতি সম্মানিত, স্বীকৃত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত। তাই যুবকভায়েরা, তোমরা ধর্ম বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন নিয়ে যদি কোন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বা গুরুর কাছে যাও, এবং তিনি যদি বিরক্ত হন ও উত্তর দিতে অস্বীকার ক'রে শুধু বিশ্বাস করতে বলেন ও কেবল মেনে নিতে বলেন—তাহলে জানবে যে তিনি আমাদের মহান ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরম্পরার অনুগামী নন। তাঁর কাছে ধর্ম শিখবে না।

আগে যে কথা বলেছি, পূজা, পাঠ, নাম, জপ, কীর্তন, আহ্নিক, মন্দির, মালা, তিলক, কাঁসর, ঘণ্টা এগুলোকেই শুধু ধর্ম মনে করা চরম ভুল, আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এগুলি আমাদের ধর্মের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এগুলি আমাদের ধর্মের প্রধান জিনিস নয়, মূল বস্তু নয়। ক্ষুদ্র অংশকেই সব মনে করার ফলে যা বিপর্যয় হতে পারে তাই হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি। গ্রামের একটা বড় বিয়েবাড়ি। অনেক লোক খাবে। রান্নাবান্না ও পরিবেশনের বিস্তৃত আয়োজন হয়েছে। একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে খাওয়াদাওয়া হবে—সেখানে জল ছেটানোর, যাতে ধুলো না ওড়ে। সে এত উৎসাহী যে খাওয়ার জায়গায় জল ঢেলে কাদা করে দিল, সব খাবারদাবারের উপরেও প্রচুর পরিমাণে জল ছিটিয়ে দিল। সব খাবার নষ্ট হল। আয়োজন পণ্ড। কেন এমন হল? কারণ, ধুলো মারতে জল ছেটানোটা যে বৃহৎ আয়োজনের একটা ক্ষুদ্র অংশ একথা বুঝতে না পেরে সে ওটাকেই কাজের বাড়ির একমাত্র কাজ বা প্রধান কাজ বলে মনে করে সব আয়োজন নষ্ট করে দিল।

আমাদের ধর্মের হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। পূজা-পাঠ, নাম-কীর্তন, ধূপ-ধুনোকেই ধর্ম বলে মনে করায় আসল ধর্ম হারিয়ে গেছে, ধর্মের মূল আয়োজন, মূল ব্যবস্থা সব পণ্ড হয়ে গেছে। আমাদের সেই মূল ধর্ম, মূল ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই অহিন্দু বা সনাতন ধর্ম বিরোধীদের কাছে আমরা বার বার হচ্ছি পর্যুদস্ত, পরাস্ত, অপমানিত, আমাদের ভূমি হচ্ছে ছোট, আমরা নিজ মাটি থেকে হচ্ছি বিতাড়িত। গলায় মালা চন্দন, আর কপালে 'রিফিউজি' এই লজ্জার চিহ্ন একসঙ্গে শোভা পাচ্ছে।

তাহলে মূল ধর্মটা কি? এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু প্রায় হাজার বছর ধরে আমাদের তথাকথিত ধর্মীয় গুরুরা, পণ্ডিতরা ও ইস্পেশাল মর্যাদা দাবী করা ব্রাহ্মণেরা এটাকে গুলিয়ে দিয়েছেন। এখনও ধর্মের ধ্বজাধারীরা, কথাকার, প্রবচনকার ও গুরুঠাকুররা গুলিয়ে দিচ্ছেন বলে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারছে না—আসল ধর্মটা কি? মালাতিলক পরে বা না পরে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বা না বাজিয়ে—যে যেমনভাবে পারে ভগবানকে একমনে ডাকাটাই কি ধর্ম? না তাও নয়। সেটাও মূল ধর্ম নয়, ধর্মের প্রধান অংশ নয়। ধর্মটা তাহলে কি?

আচ্ছা, এই শব্দগুলির সঙ্গে কি সাধারণ মানুষ খুব অপরিচিত?—সংসার ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম, ধর্মশালা, ছাত্রধর্ম, ধর্মকাঁটা, যৌবনধর্ম, ধর্ম অস্পাতাল (বাংলায় নেই, সারা ভারতে আছে), যুগধর্ম, প্রজাধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম এবং আজকের রাজনীতিতে বহু প্রচলিত শব্দ 'রাজধর্ম'। এরকম আরও বহু আছে। এই যে এতগুলি শব্দের সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি যোগ হয়ে সমাজে প্রচলিত হয়েছে—এতগুলি 'ধর্ম' শব্দ তো মালা তিলক, নাম-জপ, মঠ মন্দিরের সঙ্গেও যুক্ত নেই। তাহলে এগুলোকেই কেন প্রধান ধর্ম বলে মনে করা হয়? এই যে উদাহরণগুলো ঃ সংসার, গার্হস্থ্য, পিতৃ, পুত্র, পতি, পত্নী, ছাত্র, ক্ষাত্র, যুগ, যৌবন, রাজা, প্রজা, কাঁটা (মালবোঝাই লরি ওজনের যন্ত্র), হাসপাতাল, ধর্মশালা—এতগুলো শব্দের সঙ্গে যে ধর্ম আছে—এই ১৫টি শব্দের কোনটাতেই তো নাম-জপ, কাঁসর, ঘণ্টা, ধূপ, ধুনো, মন্ত্র, তন্ত্র, আহ্নিক কিছুই নেই। তাহলে ধর্ম বলতে ওগুলো সব বাদ, আর এগুলোই শুধু ধর্ম হয়ে গেল কি করে?

আমাদের সমাজে এতগুলি শব্দের সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি যুক্ত হয়েছে, কারণ, এগুলোই হচ্ছে সমাজের সর্বসাধারণের জন্য করণীয় আসল ধর্ম, প্রধান ধর্ম। এই প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা এক একটি কর্তব্য বা ভূমিকাকে বোঝানো হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে—একটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় সুনির্ধারিত কর্তব্যের নাম ধর্ম। উদাহরণ ঃ একটি ১২ বছরের বালক ভোর পাঁচটায় উঠে পড়তে বসল—সে তার ছাত্রধর্ম পালন করছে। বেলা সাড়ে আটটার সময় মা বলল, খোকা, ঘরে সরষের তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, দোকান থেকে এক কিলো তেল নিয়ে আয়। ছেলেটি উত্তর দিল, না মা, আমার পড়ার ক্ষতি হবে, আমি এখন দোকান যেতে পারব না, অন্য কাউকে পাঠাও। ছেলেটি তার পুত্রধর্ম পালন করল না। ছাত্রধর্ম পালন করল, কিন্তু পুত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হল। এখন এই বালকটিকে শিক্ষা দিতে হবে যে, কোন্ ধর্ম কখন কোথায় কতটা পালন করতে হবে। এই শিক্ষার নাম ধর্মশিক্ষা, শুধু গীতার শ্লোক মুখস্থ করানোটা ধর্মশিক্ষা নয়।

সুতরাং, এককথায় কর্তব্যই হচ্ছে ধর্ম। পিতার কর্তব্য পিতৃধর্ম, মাতার কর্তব্য মাতৃধর্ম, গৃহস্থের কর্তব্য গার্হস্থ্যধর্ম, রাজার কর্তব্য রাজধর্ম, প্রজার কর্তব্য প্রজাধর্ম। প্রতিবেশীর কর্তব্য প্রতিবেশীধর্ম, সমাজের প্রতি কর্তব্য সমাজধর্ম, যুগের কর্তব্য যুগধর্ম। বোঝা খুব কঠিন হচ্ছে কি? এটা না বুঝিয়ে আমাদের গুরুঠাকুররা শুধু মুক্তি মুক্তি মুক্তি, ভক্তি ভক্তি ভক্তি করে কান ঝালাপালা করে সাধারণ মানুষকে তার আসল ধর্ম, অর্থাৎ কর্তব্যধর্মটাই ভুলিয়ে দিয়েছেন, গুলিয়ে দিয়েছেন—খুব সৎ উদ্দেশ্যে নয়।

অথচ আমাদের শাস্ত্র পুরাণে খুব স্পষ্ট করে বারবার বলা হয়েছে। শিবিরাজার গল্প—শরণাগত পায়রাটিকে আশ্রয় দেওয়াটাই ধর্ম, সেই ধর্ম রক্ষা করতে শিবিরাজা নিজের উরু থেকে পায়রার ওজনের সমান মাংস কেটে দিলেন। আছে মহাভারতে ধর্মব্যাধের গল্প, যেখানে পতিব্রতা নারীকে ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যাধকেও একজন তপস্বীর থেকে অধিক ধার্মিক বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আছে নারায়ণ, নারদ ও কৃষকের গল্প। যেখানে স্বয়ং নারায়ণ নারদের হাতে তেলের বাটি দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন যে সারাদিন নারায়ণের গুণগান করা নারদের থেকেও দিনে মাত্র দু'বার হরির নাম নেওয়া পরিশ্রমী কর্তব্যপরায়ণ কৃষক নারায়ণের বড় ভক্ত। রাম পিতৃসত্য রক্ষা করতে সত্যধর্ম পালনের জন্য বনে যাচ্ছেন, রাজধর্ম পালনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করছেন, আবার পতিধর্ম পালনের জন্য পুরোহিতের আদেশ সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ না করে সোনার সীতা পাশে বসিয়ে যজ্ঞ করছেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার তিরস্কার করছেন সে ক্ষাত্রধর্ম বিচ্যুত হচ্ছে বলে। এগুলো ধর্ম নয়? এগুলোই ধর্ম। এইসব না শিখিয়ে গুরুঠাকুররা শেখাচ্ছেন— মুক্তিলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ভগবদ্‌প্রাপ্তি, ভববন্ধন মোচন—এগুলোই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর কি করে এগুলো হবে? শুধু গুরুভক্তি দিয়ে আর গুরুর কৃপায় হবে। তাই নিজের বৌ ছেলেপিলে, মা বাবা, ঘর সংসার সব ভুলে শুধু গুরুর চরণ ধর। গুরু তোমাকে ভবসাগর পার করে দেবেন। এই গুরুঠাকুররা আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ চতুর্বর্গ বা চার পুরুষার্থের কথা জানেন? মনুষ্য জন্ম নিয়েছ যখন, তখন তোমাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ পালন করতে হবে। মোক্ষের কথা ভাববে জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে। অর্থাৎ সংসারের সব কর্তব্য সম্পূর্ণ করে, এমনকি বাণপ্রস্থ অবস্থায় সামাজিক কর্তব্য পালন করে, যখন আর কোন কর্তব্য বাকি নেই, তখন শুধু সারাদিন ভগবদ্‌চিন্তা করবে, মোক্ষ বা মুক্তির কথা ভাববে। তার আগে ভাবলে সব অনর্থ হবে। এই গুরুঠাকুররা কি জানেন না যে শাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম, এই গার্হস্থ্য আশ্রমই বাকি তিন আশ্রমের আধার। এই গুরুঠাকুররা কি জানেন না আমাদের মহান শাস্ত্রের সেই বিখ্যাত শ্লোক— ''ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচম্ ইন্দ্রিয় নিগ্রহম্; ধীর্বিদ্যা সত্যম্ অক্রোধ দশকং ধর্মলক্ষণম্।'' ধর্মের এই শাস্ত্রোক্ত দশটি লক্ষণের মধ্যে পূজাপাঠ, নামজপ, ভগবদ্ভক্তি এসব কোথায় আছে? শাস্ত্রের এই ধর্মের ব্যাখ্যা কি ভুল?

এসব জানা সত্ত্বেও গুরুঠাকুররা সাধারণ ভক্তিমান ধর্মপ্রাণ মানুষকে সংসারবিমুখ, সমাজবিমুখ করে দিচ্ছেন। ফলে তারা তাদের কর্তব্য করছে না। তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা। আর এই কর্তব্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিচ্ছে বিধর্মীরা, সনাতন ধর্ম নষ্টকারীরা। এক মন্দিরে যাওয়া ভক্ত যখন শোনে যে একমাইল দূরে ঐ দেবতারই আর একটা মন্দির ভাঙছে কিছু বিধর্মীরা, তখন এই ভক্তটি সেখানে ছুটে যাওয়ার কর্তব্য অনুভব করে না। সে তখন এই মন্দিরেই দেবতাকে আরও ২৫ বার বেশী করে কপাল ঠুকে প্রণাম করাটাই সংকোটমোচনের একমাত্র উপায় বলে মনে করে। কারণ, কোন গুরু-পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ তাকে শেখায়নি যে বিধর্মীর হাত থেকে মন্দির রক্ষা করতে লাঠি হাতে ছুটে যাওয়াটা ধর্ম। ওই সময় নাম জপ করাটা অধর্ম। এই শিক্ষা নেই বলেই সারা বিশ্বে হিন্দুর মন্দির ভাঙে, মূর্তি ভাঙে, দেবদেবী হয় ব্যাঙ্গের শিকার, হিন্দু নারী হয় গণধর্ষিতা, তবু ভক্তদের হাতের জপের মালা নামে না, থামে না, হাতে অন্য কিছু ওঠে না। এরা ভাবে, সবই হরির ইচ্ছায় হচ্ছে। হরিই বাঁচাবেন। এরা নির্বোধ। আমাদের ধর্মের কুশিক্ষা এদেরকে নির্বোধ করেছে। আর এই কুশিক্ষাতে এরা কাপুরুষে পরিণত হয়েছে। হরি কাউকে বাঁচান না। এরা হরির কার্যপ্রণালী কিছুই বোঝে না। সত্যযুগে হরি প্রহ্লাদকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বাপরে কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনদের বাঁচানোর জন্যও নিজে একবারও অস্ত্র ধরেন নি। ওদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন—নিজের লড়াই নিজে লড়। আবার এই কৃষ্ণই—তাঁর উপর যত অত্যাচার, অপমান, আক্রমণ হয়েছে, তার প্রতিকারে অর্জুন ভীমকে ডাকেন নি। সে লড়াইগুলো তিনি নিজে লড়েছেন। পুতনা, অঘাসুর, বঘাসুর, কংস, শিশুপাল—এদেরকে নিজের হাতে মেরেছেন, অন্যের সাহায্য নেননি। অথচ দুঃশাসন, দুর্যোধনকে মারার সময় ভীমকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে গদা তুলে নেননি। সেই কৃষ্ণ এখন হিন্দুর মন্দির ভাঙলে, হিন্দু নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হলে বাঁচাতে আসবেন? তিনি আসেননি ১৯৪৬, ৪৭, ৫০, ৬৪, ৭১ সালে কিংবা ২০০১ সালে ঐ হরিভক্তদের পূর্ববঙ্গে। এই হরিভক্তরা হরির নামের লজ্জা। কাপুরুষ কখনো কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না।

ঠিক এইরকম নিষ্ক্রিয়তা, সংসার বিমুখতা, সামাজিক কর্তব্যহীনতা ও passivity ভারতে তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে। এর সুদূরপ্রসারী কুফলের কথা দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য। তখন দেশসুদ্ধ লোক বৌদ্ধবিহারগুলিতে চলে যাচ্ছে ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী হতে। দেশ ও সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাগুলি পড়ছে ভেঙে। শঙ্করাচার্য্য বুঝতে পেরেছিলেন এর ফলে যেমন সৃষ্টি হবে সামাজিক অনাচার, তেমনি ভেঙে পড়বে দেশরক্ষা ব্যবস্থা। তাই তিনি সারা দেশ ভ্রমণ করে পুনরায় সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধধর্মের সংসার বিমুখতা ও কর্তব্যহীনতা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সনাতন ধর্মের ব্যবস্থায়। শঙ্করাচার্য্যের সেই দূরদৃষ্টি, পৌরুষ ও সক্রিয়তার ফলেই এ দেশটা বেঁচে গিয়েছে। আজকের আফগানিস্তান ও পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের ফলেই ওই এলাকাগুলি অতি সহজেই ইসলামের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ওই দুই জায়গাতেই আজ তালিবান, জামাত-ইসলামী ও হুজিদের বাড়-বাড়ন্ত।

আমাদের হিন্দু সমাজের বর্তমানে এই চরম নিষ্ক্রিয়তা, চরম passivity-র জন্য শুধু সাধারণ মানুষ ও ভক্তরাই একমাত্র দায়ী নয়। দায়ী যারা সাধারণ মানুষকে ধর্মের মূল শিক্ষাটা গুলিয়ে দিয়ে কর্তব্যধর্মটা ভুলিয়ে দিয়েছে তারা। আজকের এই বিপন্ন বাঙলায় হিন্দু যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম ও কর্তব্যধর্ম সম্বন্ধে আমার এটুকুই নিবেদন।

প্রথম পাতার শেষাংশ

হরিণঘাটায় মেলা ও মন্দির আক্রান্ত

৩১মার্চ পাগলা তলায় হিন্দু সংহতির রাজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে পুলিশের বাগবিতন্ডা

পুলিশ মুসলিম এলাকা রেড করে এবং ১২/১৩ জন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাটিকে চাপা দেওয়ার জন্য হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও ধর্মীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করে পুলিশ ভাঙা দেবদেবীর মূর্তিগুলিও থানায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতার চাপে পরেরদিনই ঐ মুসলিমরা ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশ তাদেরকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে জামিনে ছাড়ে না কেস না দিয়ে এমনি ছেড়ে দেয়—তা জানা যায় না। ৩১শে মার্চ এ্যাডভোকেট ব্রজেন রায় ও সুজিত মাইতির নেতৃত্বে হিন্দু সংহতির একটি প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে থানায় গেলে থানার ও. সি. ও আই.ও.-র সঙ্গে তাদের দেখা হয় না অথবা তারা দেখা করেন না। থানার ডিউটি অফিসার এই প্রতিনিধি দলকে কোন তথ্য দিতে অস্বীকার করেন, এমনকি কেস নম্বরও দেন না।

২৯শে মার্চ ঐ দুষ্কৃতিকারীরা ছাড়া পেয়ে বুক ফুলিয়ে এলাকায় ফিরে এলে স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইতিমধ্যে মেলায় হামলা, মূর্তিভাঙা, লুটপাট ও মহিলাদের ইজ্জতহানির খবর ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। আশপাশের অঞ্চল থেকে বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রধান কাষ্ঠডাঙ্গা ১ ও ২ অঞ্চল থেকে, গাইঘাটা, জলেশ্বর, চাকদহ চৌরাস্তা ও বহু এলাকা থেকে হাজার হাজার হিন্দু ছুটে আসে পাগল ঠাকুরের মেলা স্থানে। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে, দলীয় পরিচয় ভুলে সব হিন্দু এক হয়ে যায়। তারা বোঝে যে তাদেরকে বাঁচানোর, তাদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য কোন দল নেই, পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই। তারা বোঝে এর প্রতিকার তাদের নিজেদেরই করতে হবে। মেলা কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় পরেরদিন অর্থাৎ ৩০শে মার্চ চারিদিকে রাস্তা অবরোধ করা হবে। সেদিন অর্থাৎ ১৫ই চৈত্র (৩০শে মার্চ) ছিল পাশেই বিশ্বাসপাড়ায় খুদার মেলা। সেদিন সকাল থেকে ৩০০/৪০০ জন করে হিন্দু চারিদিকে পাঁচ/ছয়টি রাস্তা অবরোধ করে। সমস্ত যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুদের তীব্র ক্ষোভের সামনে পড়ে ঐ খুদার মেলা বসতেই পারেনি। তখন শুরু হয় নেতাদের ও প্রশাসনের দৌড়াদৌড়ি। বিশাল র‍্যাফ বাহিনী নামানো হয়, কিন্তু হিন্দুরা অনড়। তাদের দাবী, প্রতিকার চাই। ঐদিন বিকালের পর একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এসে আসামীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ ওঠে। কিন্তু খুদার মেলা আর বসতেই পারে নি।

মুসলিম দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করার জন্য তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদ সদস্য বিশ্বজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দলের উপর স্তরে খবরও গেছে। তাই হিন্দু ভোট হারানোর আশঙ্কায় কয়েকদিন পর এসেছেন এলাকার এম.পি. গোবিন্দ নস্কর। তিনি ঘুরে যাবার পর পুলিশ আবার সক্রিয় হয়েছে। তবে সেও এক মজার কাহিনী। হিন্দু ভোটও চাই, আবার মুসলিম দুষ্কৃতিদের গায়ে হাত দিয়ে মুসলমানদেরও চটানো যাবে না। তাই বের হয়েছে অপূর্ব পন্থা। পুলিশ ১০/১২ জন সাধারণ মুসলিম ক্ষেতমজুরকে ধরে নিয়ে গেছে। আর এদের জন্য কোন একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মাথাপিছু দুই শত টাকা রোজ হিসাবে তাদের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে বলে এলাকার মানুষ জানতে পেরেছে। বর্তমানে এলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় আছে, পুলিশ পিকেটিং আছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পাশেই কাষ্ঠডাঙ্গা বাজারে হরিমন্দিরে এক বছর আগে মুসলিমদের আপত্তিতে মন্দিরের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর গত দুর্গাপুজোর সময় একটি ছোট্ট বিবাদকে কেন্দ্র করে পাশের গ্রাম উত্তরপাড়ার এক বিজেপি সমর্থক কার্তিক মণ্ডলের বাড়িতে কিছু মুসলিম দুষ্কৃতিকারী হামলা করে। প্রচণ্ড অত্যাচারের ফলে সেই রাত্রেই তার ৭মাসের গর্ভবতী স্ত্রী প্রার্থনা মণ্ডলের অসময়ে বিকৃত অঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়। এরপর এই পাগলতলা মেলার ঘটনা। এসবের অনিবার্য পরিণাম—পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে অবস্থাপন্ন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুরা তাদের জমি জায়গা মুসলিমদের কাছেই বিক্রি করে এলাকা ছাড়বে, কারণ দেওয়ালের লিখন তারা স্পষ্টই পড়তে পারছে যে সমগ্র নদীয়া জেলায় দ্রুত তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশ তৈরির পটভূমি। বরিশালের ভোলা (২০০১ সাল) আর নদীয়ার ধানতলা (২০০৩ সাল)— একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি।

হায়দ্রাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে শহরে এক সপ্তাহব্যাপী হিন্দু মুসলিম সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ধর্মীয় পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে এই দাঙ্গায় বেশ কয়েকজন মারা যান। তাঁদের মধ্যে আছেন কে সত্যনারায়ণ। তিনি মোটরবাইকে করে যাওয়ার সময় তাঁর বাইক থামিয়ে দুষ্কৃতিরা তাঁর বুকে ছোরা মারে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে হায়দ্রাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা ৪২ শতাংশ। পুরানো হায়দ্রাবাদে এই অনুপাত আরও বেশী। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এই দাঙ্গা থামাতে পুরানো শহরের ১৭ টা থানা এলাকাতেই কার্ফু জারি করতে হয়। ৩০ শে মার্চ হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তার আগের দিন সোমবার ছুরিকাঘাতে আহত ১৬ জন এবং মাথা ফেটে ৪ জন শহরের ওসমানিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা খুব খারাপ। শনি, রবি, সোম মাত্র ৩ দিনে মোট ৮০ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়।

শহরের আলিয়াবাদ এলাকায় কমপক্ষে ১৪ বাড়ী লুট হয় ও একটি বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুরানো শহর এলাকায় ১২ টি গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মোট ১০০ জন গ্রেফতার হয়েছে। কেন্দ্র সরকার থেকে র‍্যাফ, সি . আই . এস. এফ ও সি . আর . পি . এফ-এর মোট ১৮০০ জওয়ানকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হায়দ্রাবাদে পাঠানো হয়েছে। এক সপ্তাহ টানা কার্ফু চলার পরে ধীরে ধীরে কার্ফুর সময় কমানো হয়েছে।

এই মার্চ মাসেই তিন সপ্তাহ ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশের বেরিলি শহরে। এখানেও মুসলিম জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ।

(সূত্র ঃ- টাইমস্ অব ইন্ডিয়া ঃ ৩০.৩.১০)

হিন্দু মহিলাদেরও পর্দা প্রথা মানতে হবে

আটারী, ৬ ফ্রেব্রুয়ারী '১০। পাকিস্তানে তালিবানদের নয়া ফরমান (হুকুম) হিন্দু পরিবারের মেয়েরাও বাজারে গেলে পর্দানশীন অর্থাৎ বোরখা পরতে হবে। এই তালিবানী হুকুম পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের পছন্দ না হলেও মহিলাদের বোরখা পরেই বাইরে যেতে হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তান থেকে হিন্দু পরিবারদের পলায়ন চলতে থাকলেও এমন বেশ কিছু হিন্দু পরিবার আছেন যাঁদের ভারতে থাকার অনুমতি না পাওয়ায় তাঁদের পাকিস্তানে ফিরতে বাধ্য করা হচ্ছে।

২১ বছরের প্রিয়ংকা ২৮ দিন পরে পাকিস্তানে আসার সময় ভীত-সন্ত্রস্ত। মুখে ভাষা নেই, চোখ জলে ভরা। আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন আটারীর ২ নং প্ল্যাটফর্মে সমঝোতা এক্সপ্রেসের জন্য অপেক্ষারতা। অথচ তিনি চান আরও কিছু দিন ভারতে থাকতে। কিন্তু ভিসার মেয়াদ আর মাত্র দু'দিন বাকি। প্রথমে কোনও কথা বলতে চান নি। কিন্তু হিন্দু পরিবারবর্গের উপর পাক জুলুমের কথা তুলতে প্রিয়াংকার মুখ আতংকে কালো হয়ে গেল। প্রিয়াংকারা দু'বোন, এক ভাই। বাবার সিন্ধুপ্রদেশে মুদির দোকান। পড়াশোনা গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত। ভায়ের সাথে কলেজে গিয়ে ভর্তি হতে চাইলে হিন্দু বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ছোট বোন ম্যাট্রিক পড়ছে। বাড়ীর সকলের ইচ্ছা থাকলেও বোনকেও আর পড়ানো যাবে না।

তালিবানী হুকুমে হিন্দু বালিকারাও বোরখা পরতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য তাতে একটা সুবিধা যে, হিন্দু বালিকাদের পথে-ঘাটে আলাদা ভাবে বোঝা যাবে না, হিন্দু-মুসলিম বালিকা বা মহিলা সকলেরই বোরখা—সমানতা বিরাজ করছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী

ওয়াশিংটন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন জম্মু-কাশ্মীরে তাদের নিজেদের বসবাসের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবী করে আমেরিকান সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল কাশ্মীর ফাউণ্ডেশন (IKF) -এর এক প্রতিনিধিমণ্ডল আমেরিকার বিদেশ বিভাগের এক বরিষ্ঠ অধিকারীর সাথে সাক্ষাৎ করে। এ ব্যাপারে আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটনকে একটি জ্ঞাপন পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে 'পুনুন কাশ্মীর' অর্থাৎ আমাদের কাশ্মীরে কাশ্মীরি হিন্দুদের জন্য এক পৃথক নিরাপদ ভূখণ্ড চাই যেখানে তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের সুযোগ পাবে। কাশ্মীরি হিন্দুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই প্রাথমিক প্রয়োজন। তারা বাঁচলে তবেই তাদের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজেদের স্বভূমিতে ফিরে যেতে চান। শত সহস্র বছর ধরে কাশ্মীর-ই তাঁদের নিবাস, তাঁদের জীবিকার্জনের জায়গা, তাঁদের মূল শিকড় সেখানেই।

IKF জানিয়েছে, বর্তমানে তারা বাঁচার তাগিদে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা হারাতে বসেছে। ভারতীয় কাশ্মীরের মধ্যে আলাদা রাজ্য গঠন করে ভারত সরকার যেন এই সমাজকে নির্ভয়ে জীবনধারণ ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের সুযোগ করে দেন।

হিন্দু তীর্থযাত্রীদের পাকিস্তান যাত্রা বয়কট

অমৃতসর। প্রতি বছর শিবরাত্রি উপলক্ষে পাকিস্তান স্থিত কাটাসরাজ ধামে ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা তীর্থ করতে যান। কিন্তু এ বছরে তাঁরা তীর্থযাত্রা বয়কট করতে বাধ্য হন। তার কারণ এ বছর ভারত সরকারের হিন্দু বিরোধী নূতন নীতি প্রণয়ন। কাটাসরাজ যাত্রা সংস্থার পক্ষ থেকে সকল তীর্থযাত্রীর পাশপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সরকারী নীতির প্রতিবাদে ফেরত নেওয়া হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের দাবী যে, সুরক্ষা সম্বন্ধীয় হলফনামা যদি তাদের পেশ করতে হয় তাহলে 'রাজীব-বেনজির সমঝোতা চুক্তি' বাতিল করা হোক। তীর্থযাত্রী 'জাঠা'-র প্রমুখ শিবসেনা নেতা শ্রী সুরিন্দর কুমার বিল্লা বলেন, এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার কাটাসরাজ ধামের যাত্রীদের নিকট হতে এক হলফনামা দাবী করেন যার বয়ানে আছে—যে সকল যাত্রী পাকিস্তানে যেতে চান তাঁরা নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে। পাকিস্তান গমনকারী জাঠার উপর কোনও হামলা বা আক্রমণ হলে তার দায়িত্ব যাত্রীর নিজের অথবা তাদের নিয়ে যাওয়া সংস্থার উপর বর্তাবে। যে যাত্রী উক্ত বয়াননামায় স্বাক্ষর করবে তাকেই কেবল পাকিস্তান যাওয়ার ভিসা দেওয়া হবে। শ্রী বিল্লা এর প্রতিবাদে বলেন, কেন্দ্র সরকারের এই হিন্দু-বিরোধী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। যতদিন না কেন্দ্র সরকার সুরক্ষা সম্বন্ধীয় এই ঘৃণ্য হলফনামা বাতিল না করেন ততদিন পাকিস্তানে তীর্থযাত্রী বয়কট চলবে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com